আর্য্যযুবক-সুহৃদ

শ্রীগিরি[illegible], বি, এ,

হেড্‌মাষ্টার, শশিমুখী হাই স্কুল, হেমনগর।

এই পুস্তকের উপস্বত্ব সম্পূর্ণরূপে
হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

ঢাকা,

আশুতোষ-যন্ত্রে

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩ সন।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের

ভাবী ভরসাস্থল

উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের

ধর্ম্মোন্নতিকল্পে

এই সামান্য পুষ্পাঞ্জলী

সযত্নে সংগৃহীত হইয়া

আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয়স্থানীয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ

শ্রদ্ধাস্পদ ভূম্যধিকারী

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী

মহাশয়ের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ব্বক

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

আর্য্যযুবক সুহৃদ।

নিবেদন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানাবিধ বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পরাঙ্মুখ হয় নাই। যদিও ইহা বিধর্ম্মিগণকর্ত্তৃক বহুপ্রকারে নিপীড়িত হইয়াছে, তথাপি যেরূপ সুধাময় পূর্ণচন্দ্র দুর্দ্দান্ত রাহুকবলগ্রস্ত হইলে ক্ষণকালমাত্র সংক্ষুব্ধ থাকিয়া পরিশেষে স্বীয় সুনির্ম্মল কান্তিপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করতঃ জগৎকে সুশীতল করে, সেইরূপ সনাতন আর্য্যধর্ম্ম কিয়ৎকাল যবনগণের হস্তে নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, এবং প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ প্রতিঘাত অকাতরে বক্ষে ধারণ করিয়া, পরিশেষে স্বকীয় শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছে এবং মানবজাতি সেই মধুর ধর্ম্মরসাস্বাদনে সুস্নিগ্ধ হইতেছে।

প্রিয় যুবকবৃন্দ! তোমরা কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ হিন্দুধর্ম্মের কি কি বিশেষত্ব আছে বলিয়া

ইহা অনাদিকাল হইতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে? আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তোমরা ক্রমেই স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি আস্থা-শূন্য হইতেছ এবং চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রলোভনে প্রলুব্ধ এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছ। এসময় স্বীয় ধর্ম্ম একবার বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? যদি ইহার শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য্যের একবার উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে আর পরধর্ম্মের ভয়াবহ প্রলোভনে পতিত হইতে হইবে না।

বর্ত্তমান সময় পরিবর্ত্তনের যুগ। ভারতের বর্ত্তমান পতিত অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইবে যে ইহার সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতির বহুল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? তোমাদের ন্যায় আমিও এক সময়ে পরিবর্ত্তনের প্রখর স্রোতে পড়িয়া পরধর্ম্মের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবং সেই মোহবশে অনেক তরলচিত্ত যুবকদের মত আমিও স্বীয় ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। শুভমুহূর্ত্তে ভগবান কৃপা করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; আমার ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইল, এবং আমি আর্য্যধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতির কিঞ্চিৎ

আভাস পাইলাম, ধন্য হইলাম, জীবন সার্থক বোধ হইল।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ সাধারণতঃ রহস্যময় ও জটিলতাপূর্ণ। তথাপি যথাসম্ভব সরল ভাষাতে সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা কয়েকটী রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হইয়াছি। সহৃদয় যুবকবৃন্দ। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রবন্ধটী একবার মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিবে। যদি ইহাতে তোমাদের একজনেরও কিঞ্চিৎ উপকার হয় এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

পূর্ব্বাভাস।

হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে স্বভাবতই আমাদের মন এই হিন্দু ভূমি বা আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষের বিশেষত্বের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং আমরা দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হই যে একাধারে পার্থিব সমস্ত পদার্থের সমাবেশ ইহার মত আর কুত্রাপি নাই। (ক) অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, সুদীর্ঘ নদনদী, সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ-লতা-ফল-মূল-শস্য, সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক-বস্ত্র-প্রস্তর-ধাতু ও সর্ব্ব ঋতুর এরূপ সুন্দর সম্মিলন আর কোথায় আছে? (খ) বিভিন্ন প্রকৃতির জল বায়ুর প্রভাবে ইংলণ্ডের

মানুষ শ্বেতকায়, আমেরিকায় লোহিত, আফ্রিকায় কৃষ্ণ, কিন্তু একই ভারতে এই জল বায়ুর বিশেষত্ব হেতু শ্বেত, লোহিত, গৌর, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের মানুষ আমরা দেখিতে পাই। (গ) এই কলিযুগের বা পাপ যুগের প্রভাব সময়েও এ দেশের পর্ব্বত বিশেষের গুহায় গুহায় সংসারত্যাগী, নিষ্কাম সমাধিমগ্ন সাধু সন্ন্যাসীর অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি এরূপ আছে কি? নৈসর্গিক সমস্ত বিষয়েই যে ভারতের বিশেষত্ব, সে ভারতে ধর্ম্মের যে কোন বিশেষত্ব আছে, ইহা স্বতই মনে হয়। প্রিয় যুবকবৃন্দ, চল আমরা সেই ধর্ম্মের বিশেষত্বগুলি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে সচেষ্ট হই।

ধর্ম্মের নাম করণ।

আমাদের ধর্ম্মের নাম বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম নহে, কারণ হিন্দু শব্দ যাবনিক। গ্রীকগণ প্রথমতঃ সিন্দু নদের তীরে উপনীত হইয়া ইহাকে Indus নামে আখ্যায়িত করেন এবং এতদ্দেশবাসিগণকে হিন্দু আখ্যা প্রদান করেন, তাহা হইতে আমরা হিন্দু এবং আমাদিগের ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ এই ধর্ম্মকে আর্য্য ধর্ম্ম বলিয়াও কুত্রাপি উল্লেখ নাই, ইহা 'ধর্ম্ম' নামেই শাস্ত্রে অভিহিত, কারণ

ইহা মানব-ধর্ম্ম, মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম, মানবমাত্রেরই ধর্ম্ম, কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে। ইহার বিশেষ কোন স্থাপয়িতা নাই, তাই স্থাপয়িতার নামানুসারে কোন রূপ নামকরণও হইতে পারে নাই। যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্ম মহম্মদ প্রবর্ত্তিত, খৃষ্ট ধর্ম্ম যিশুখৃষ্ট সংস্থাপিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুদ্ধদেবের প্রচারিত, ইহা সেরূপ নহে।

সাকারবাদ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ সময়ে সময়ে আমাদিগকে সাকারবাদী বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা নিরাকার পরব্রহ্মকে সাকার ও সান্ত কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া থাকি। কথাটি আমাদের ভাবিবার বিষয় বাস্তবিক ঈশ্বর যে নিরাকার ও অনন্ত তাঁহাতে সন্দেহ আছে কি? তবে তাঁহার সাকার বা সান্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব? আমরা বলি, তাঁহার পক্ষে আবার সম্ভব অসম্ভব কি? তিনি ত আমাদের মত নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতেছেন। তবে আর তাঁহার নিরাকার হইয়া সাকার হওয়া এবং অসীম হইয়াও সসীম হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? প্রিয় যুবকবৃন্দ, মনে মনি-

তেছে না? মনের ধাঁধাঁ ভাঙ্গিতেছে না? আইস সহজে অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি।

(ক) মনে কর এই একটী দেশলাইএর কাটী, ইহাতে আগুন দেখিতেছ কি? না। আচ্ছা, ঘর্ষণ করিবামাত্র কিরূপে আকারবিশিষ্ট অগ্নির উদ্ভব হইল? তেজশক্তি বাস্তবিক এই পদার্থে নিরাকার ভাবে অবস্থান করিতেছিল, ঘর্ষণরূপ প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা তাহার সাকার মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।

(খ) আবার মনে কর তোমার হাতে এক ফোঁটা জল আছে, ইহা আকারবিশিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। আচ্ছা কিঞ্চিৎ কাল উত্তাপ লাগাইলে উহা কিরূপে কোথায় চলিয়া গেল? উহা নিরাকার ও লোক নয়নের বহির্ভূত হইয়া অসীমভাবে প্রসারিত ও অনন্ত আকাশ পানে প্রধাবিত হইল।

(গ) এইরূপে একখণ্ড বরফ উত্তাপে গলিয়া জল হয়, ও জল উত্তাপে বাষ্প হইয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যায়। এই বরফখণ্ড সাকার ও সসীম, কিন্তু তদুৎপন্ন বাষ্পরাশি নিরাকার ও অনন্ত প্রসারিত।

(ঘ) আর তোমরা তাড়িত শক্তির প্রভাব দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে ইবনাইটের (ebonite) একখানা কাল চিরুণী (যাহা বাজারে দুই তিন পয়সায়

পাওয়া যাইতে পারে) লইয়া শীতকালের অন্ধকার রাত্রে তদ্দারা চুল আঁচরাইতে থাক, দেখিতে পাইবে চড় চড় শব্দ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। আবার সেই-রূপ ঘর্ষিত একখানি চিরুণী কাগজের টুকরা, মুড়ি প্রভৃতি লঘু পদার্থের নিকট ধরিলে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। এ সমস্ত কিরূপে হয়? তাড়িত শক্তির ক্রিয়া-বিশেষমাত্র। চিরুণীখানা ঘর্ষিত হইবার পূর্ব্বেও ইহাতে তাড়িত ছিল, কিন্তু নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, সুপ্ত অবস্থাতে। তাহার আবার এরূপ আলো, এরূপ আকর্ষণ, এরূপ জাগরণ কেন হইল? অবস্থা বা ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, অর্থাৎ ঘর্ষণ দ্বারা। প্রিয় বন্ধুগণ, ভুল ভাঙ্গিল কি? একই পদার্থের অনন্ত ও সান্ত হওয়া, নিরাকার ও সাকার হওয়া, নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াবান্ হওয়া এই জড় জগতেই সম্ভব, দেখিলে ত। এখন তুচ্ছ জড় জগতেও যাহা সম্ভব, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বস্রষ্টা ভগবানের পক্ষে কি তাহা অসম্ভব হইবে? সামান্য জড়ীয় ঘর্ষণপ্রভাবে যদি তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান নিরাকার তেজ ও তাড়িৎ শক্তিকে দেশলাই এর কাটীতে বা চিরুণীর প্রান্তে প্রকাশমান করাইতে পার, তবে মহাশক্তিসম্পন্ন ভক্তি বিশ্বাসের প্রখর ঘর্ষণে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার পরব্রহ্মের প্রতিমাদিতে আবির্ভূত

হওয়া সাকার ভাবে স্বচ্ছকাবে স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশমান হওয়াই কি আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস যোগ্য হইবে?

প্রতিমা পূজা।

আমাদের এই যে প্রতিমা পূজা, বাস্তবিক ইহা কি খড় মাটীর পূজা? পাগল ব্যতীত কেহই একথা বলিবে না যে হিন্দুগণ অথবা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই খড়মাটী প্রভৃতি কোন জড় বস্তুর পূজা করে। আর্য্য ঋষিগণের তপঃসিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে জড় মূর্ত্তিতে ভগবানের বিশেষরূপ প্রকাশ আবাহন করিয়া তবে হিন্দুগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ কি জানেন না যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান? কিন্তু জানিলে কি হইবে। এই সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝিতে পারিয়াও তাঁহারা জানিন, সাধারণে ইহা ধারণা করিতে অক্ষম, তাঁহারা জানেন, প্রতিমাতেও ভগবানের যেরূপ অস্তিত্ব অন্যত্রও তাঁহার সেরূপ বিদ্যমানত্ব, তথাপি আপনাদের সাধন সহায়তার জন্য, সীমাবদ্ধ মনের বিষয়ীভূত করিবার জন্য প্রতিমাদিতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব কামনা করিয়া থাকেন, সিদ্ধমন্ত্রশক্তির প্রভাবে ও ভক্তিবলে সহজেই তাহা

সংসিদ্ধ হয়, ভগবান ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের প্রতিমাদিতে আবির্ভাব কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং প্রতিমাদিতে তাঁহার অবিদ্যমানত্ব কল্পনা করিলেই তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব অস্বীকার করা হয় কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা।
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥"

গাভীর সর্ব্বাঙ্গেই দুগ্ধ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু স্তনমুখ হইতেই যেমন তাহা বহির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান পরমেশ্বর প্রতিমাদিতে শোভা পাইয়া থাকেন। এখন দেখিলে প্রতিমা পূজা জড়োপাসনা নহে, খড়মাটীর পূজা নহে, বাস্তবিক সেই পরব্রহ্মেরই পূজা।

আচ্ছা, বলিতে পার, প্রতিমা দেখিয়া সাধারণতঃ ঈশ্বরভাব আসে না কেন? চল আমরা প্রকৃত সাধক ভক্ত পূজককে জিজ্ঞাসা করি। সাধক বলিতেছেন, দেখ, তোমরা হয় তো সূর্য্যগ্রহণের সময় পাথরে জল রাখিয়া তাহার ভিতর সূর্য্যবিম্ব অনেকেই দেখিয়াছ। যখন প্রথম তাকান যায়, তখন কি দেখিতে পাও? জল ও পাথর। কিয়ৎকাল তাকাইয়া থাকিলে সূর্য্যের জ্যোতি ও

দেখিতে পাওয়া যায়। ঐভাবে আরো কিয়ৎকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, তখন জল ও পাথর তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে, সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যবিম্ব টলমল করিতেছে দেখিতে পাইবে। ঠিক সেইরূপ প্রতিমাদিতে প্রথম দৃষ্টিতে ভগবদ্ভাব না আসিতে পারে, কিন্তু ইহাতে ভগবানের বিশেষ অধিষ্ঠান হইয়াছে ইহাই বিশ্বাস করিয়া ভক্তি সহকারে ধ্যান করিতে করিতে, খড়, মাটী, কাঠের পুতুল কোথায় অন্তর্হিত হয়, সাক্ষাৎ সচ্চিতানন্দ বিগ্রহের অপরূপরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া সাধকের ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সুনির্ম্মল শান্তিমুখ প্রদান করিতে থাকে। সাধক তখন "ধন্যোঽহং, আমি ধন্য হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল, এইরূপ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। তবেই বুঝিলে প্রতিমা পূজা ধুলা খেলা বা ছেলে খেলা নহে, জড়ের উপাসনা নহে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেরই উপাসনা।

একেশ্বরবাদ।

প্রিয়যুবকবৃন্দ! এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হিন্দুগণ যে এত দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? জগতের সকলে একেশ্বরবাদী আর আমাদের নিকটই কি কেবল ঈশ্বর

অনেক ? আইস এবারও আমরা সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি। রাম বাবু স্কুলে মাষ্টারী করেন, আবার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে মাঝে মাঝে বিচারাসনে বসেন। ছাত্রগণ মাষ্টার মহাশয় বলে, উকীল মোক্তারগণ হুজুর বলেন, পিতামাতা ছেলে বলেন, ছেলে মেয়ে বাবা বলে ও ছোট ভাই দাদা বলে। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ডাকিলেও এক রাম বাবুই উত্তর দিতেছেন। তাঁহার নাম যখন রাম, তখন সকলেই রাম বলিয়া ডাকিলেই তো হইত। কিন্তু মানুষ নানাপ্রকার সম্বন্ধে জড়িত বলিয়া, **যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার নিকট সেই রূপ আখ্যাই প্রাপ্ত হন।** আর ঐ এক রামই পুত্ররূপে মাতার স্নেহ ভোগ করেন, পিতৃরূপে সন্তানকে স্নেহ দান করেন, শিক্ষকরূপে বিদ্যাদান করেন, গৃহস্থরূপে দরিদ্রকে ধনদান করেন ও বিচারকরূপে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সেইরূপ এক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মই অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী, ধনদাত্রী লক্ষ্মী, পাপাসুর নাশিনী কাল ভয় বারিণী কালী, বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সিদ্ধিদাতা গনেশ, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, রক্ষাকর্ত্তা, বিষ্ণু, প্রলয় কর্ত্তা শঙ্কর ও বিচারকর্ত্তা ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি নানা-রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। প্রেমাবতার খৃষ্টদেব জগতের

মুক্তির জন্য ক্রুশোপরি স্বীয়জীবন বিসর্জ্জন দিলেন, তাই তাঁর প্রেমের মূর্ত্তি খৃষ্টসমাজে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। এইরূপে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি মহামহিমময়ী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি, এবং জন্মদাতা পিতামাতার মূর্ত্তি জনসমাজ কত যত্নে রক্ষা করিতেছেন। সেই রূপ সেই একমেবাদ্বিতীয়ং করুণাময় পরব্রহ্ম, দুর্ব্বল ও অপূর্ণ প্রকৃতি জগজ্জীবের হিতের জন্য সাধকের সাধনসহায়তার জন্য যখন যেরূপে লীলা করিয়াছিলেন, যখন যেরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সর্ব্বদর্শী আর্য্যঋষিগণ করুণা করিয়া সন্তান সন্ততির জন্য, আমাদের জন্য তাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কল্পিত নহে। যেরূপেই পূজা কর, সেই একেরই পূজা হইবে। তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন।

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" ॥ ৪—১১

অর্থাৎ যে আমাকে যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি, হে পার্থ। মানুষ সব্বপ্রকারেই (অর্থাৎ দেবদেবীর পূজা করিলেও) আমরাই ভজনমার্গই অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাহারা দেবদেবীরূপে আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।

প্রি. পাঠক। বুঝিলে আমরাও একেশ্বরবাদী।

পূজোপকরণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হিন্দুগণ ফলফুল ধূপধুনা নৈবেদ্য প্রভৃতিদ্বারা ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সমস্ত তাঁহারই সৃষ্ট, তাঁহারই সম্পত্তি, ইহা তাঁহাকে উৎসর্গ করণে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কেন? তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দিলে কি ফল হইবে? কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার ধ্যান ধারনা কর, দয়াল তিনি, তাঁহার জীবের প্রতি কত দয়া, তাহাই অনু-ধাবন কর, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও, তাঁহার গুনগান কর, ইহাতেই তাঁহার উপাসনা হইবে, খৃষ্টীয় বা ব্রাহ্মভ্রাতাগন ইহাই বলিবেন। কি সুন্দর কথা।। প্রিয় বন্ধুগণ হয়, তো মনে করিতেছ, বাস্তবিকই তো। কেন অনর্থক কষ্ট করিয়া ফলফুল সংগ্রহ করা, ধূপধুনার আড়ম্বর করা? কিন্তু আইস, আবার হিন্দু সাধকের নিকট যাই, তিনি এসম্বন্ধে কি বলেন, ইহার কি মীমাংসা করেন। সাধক বলিতেছেন, তোমরা দুই ভাই, তোমার পিতা দুইটী সুন্দর সুমিষ্ট ফল আনিয়া তোমাদের হাতে দিলেন, তুমি খাইয়া বড় তৃপ্তি পাইলে, আর বাবাকে শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলে, সহস্রমুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলে, আর তোমার অপর ভ্রাতা—সে

ফলের মিষ্ট-স্বাদে মোহিত হইল, আনন্দে আকুল হইল, এমন সুন্দর, এমন উপভোগের সামগ্রী একা উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল না, দৌড়াইয়া বাবার নিকট গেল, হর্ষ-গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিল, "বাবা, বড় মিষ্টি, তুমি একটু খাও।" প্রিয় বন্ধুগণ। কি বুঝিলে। পিতার মনের ভাব কিরূপ হইবে, ভাব তো দেখি। পিতা কি সন্তানের এভাবে বিভোর হইবেন না? তাহাকে কি কোলে করিয়া শতবার মুখচুম্বন করিবেন না। সর্ব্বস্ব দিয়া কি তাহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইবে না? হৃদয় থাকে তো এভাব সহজেই বুঝিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতেছি, সন্তান কি জানে না বাবার ফলের অভাব নাই? বাবাকে সন্তুষ্ট করা তাহার ইচ্ছা নহে। নিজের তৃপ্তি সাধনই তাহার বাসনা। তাই সাধক বলেন দেখ, আমি কি জানি না ফুলফল তাঁহারই সামগ্রী, আমি কি জানি না তিনি সদানন্দ, তাঁহার আবার কি আনন্দবর্দ্ধন করিব? কিন্তু আমার যে তৃপ্তি চাই; তাঁহার প্রদত্ত সুন্দর সুমিষ্ট ফুলফল, সুগন্ধি ধূপ ধুনা, যাহার উপভোগে আমি তৃপ্ত হই, তাহা তাঁহার চরণ প্রান্তে না দিলে আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? তাঁহার সম্পত্তি ছাড়া আর তাঁহাকে দিবার কি আছে? কিছুতেই তো খুঁজিয়া পাই না। মনপ্রাণ সমর্পণ করি; তাহাও যে তাঁহারই, আমাকে

উৎসর্গ করি, আমিও যে তাঁহারই। প্রিয় পাঠক। এখন বুঝিলে ভিন্ন সম্প্রদায়ীগণ ও যদ্দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, আমরাও তাঁহাদ্বারাই অর্থাৎ তাঁহার বিষয় দ্বারাই তাঁহার পূজা করিয়া থাকি। তাঁহারা ভক্তি-পুষ্প অর্পণ করেন, আমরা ভক্তি ও পুষ্পে পূজা করি। ভক্তি ও তাঁহার, পুষ্পও তাঁহারই প্রদত্ত। ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বিনয় প্রভৃতি, হৃদয়ের সুন্দর ভাব সমূহ এবং ফল ফুল, ধূপ ধুনা প্রভৃতি জড় জগতের সুন্দর বস্তু সমূহ সাধক যাহা সুন্দর দেখেন তাহাই সুন্দরতমের সুন্দর চরণে অর্পণ করেন নিজের তৃপ্তির জন্য, নিজের সাধন সিদ্ধির জন্য, নিজের আত্মোন্নতির জন্য। প্রিয় পাঠক, বুঝিলে, ফল ফুলের পূজাও ছেলে খেলা নহে, বৃথা আড়ম্বর নহে। মানসোপচার সমূহে যুক্ত হইয়া এই সমস্ত বাহ্যোপকরণ সাধকের ভক্তি, শান্তি, আনন্দ ও আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

একভাবে ধরিতে গেলে জাতিভেদ নাই, এমনদেশ নাই। ইংলণ্ডেও (nobility, gentry commonalty) উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণী—এই তিন শ্রেণীতে

সমাজ বিভক্ত। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যেও Patricians এবং Plebeians ছিল্। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ধৰ্ম্মমত এক হইলেও পরস্পরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভবপর নহে। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে মানুষ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেই হইবে। কিন্তু এখন দেখিতে হইবে, জাতিভেদে আমাদের বিশেষত্ব কি? ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়েই হিন্দু, অথচ চণ্ডালপ্রদত্ত জল পর্য্যন্ত ও ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য। এইটুকুই হিন্দুর জাতিভেদের বিশেষত্ব, সুতরাং এই বিষয়টীই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। প্রিয়পাঠক! বিষয়টী একটী সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর সংস্থাপিত। চল, আমরা সাবহিত-চিত্ত, সরল দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে প্রয়াস পাই।

তোমরা সকলেই জান, কোন স্থানে আগুন জ্বালিলে তাহার চারিদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে। আবার সুশীতল সরোবরের নিকট যাও, দেখিবে চারিদিকের বায়ুও শীতল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তোমরা দেখিয়াছ ঘর্ষিত ইবনাইটের চিরুণীখানা নিকটস্থ লঘু পদার্থগুলিকে আকর্ষণ করে, কারণ উহার চারিদিকে তাড়িতশক্তি প্রসারিত হইতে থাকে। আবার একখণ্ড চুম্বক-লোহের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহকণা রাখিয়া দেও দেখিবে উহারা তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকগাত্রে সংলগ্ন

হইবে, কারণ উহাও চতুর্দ্দিকে স্বভাবসিদ্ধ স্বকীয় আকর্ষণের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই তাপ, তাড়িত এবং চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি জড়পদার্থের স্থূল স্থূল গুণ বা প্রভাব সমূহ আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছি, এবং এই শক্তি সকলের প্রকৃতি ও কার্য্যাবলি শিক্ষা করাতে জড়বিজ্ঞানের কতই উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। স্বাধীনচেতা গৌরবান্বিতা নব আমেরিকা এই জড়বিজ্ঞানের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। মানবপ্রকৃতি অনন্তউন্নতিশীল, তাই মার্কিনবাসী শুধু জড়বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অধুনা মনোবিজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গভীর গবেষণাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ফলস্বরূপ তাঁহারা মানবপ্রকৃতির অতি সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি সপ্রমাণ করিয়াছেন, উত্তপ্ত বস্তুর চতুর্দ্দিকে যেরূপ তাপ বিকীর্ণ হয়, তাড়িতবান বস্তুর চারিদিকে যেরূপ তাড়িত বিস্তীর্ণ হয়, এবং চুম্বকের চারিদিকে যেরূপ স্বীয় আকর্ষণ প্রসারিত হয়, ঠিক সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেরই চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই স্বগুণাক্রান্ত প্রভাববিশেষ প্রসারিত আছে। তাহাকে তাঁহারা aura বা বায়ুকোষ নাম দিয়াছেন (ইহা ঠিক দেবদেবীর চিত্রে মস্তকের চতুর্দ্দিকে চিত্রিত প্রভাব মত)। যাহার যেরূপ চরিত্র তাহার প্রভাবও ঠিক সেইরূপ সৎ বা

অসৎ গুণবিশিষ্ট, এবং সেই প্রভাবের সীমার মধ্যে আসিলে অন্যকে তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে আকৃষ্ট বা অভিভূত হইতে হইবেই হইবে। এই প্রভাবের শক্তি অতি সূক্ষ্ম, তাই স্থূলদর্শী মানব স্থূলবিষয়-সমূহে অবিরত ব্যতিব্যস্ত থাকে বলিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। তাড়িতবান পদার্থ যেরূপ সমস্ত বস্তুকেই আকর্ষণ করিলেও স্থূল বা ভারী বস্তুসমূহে তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না, কেবল লঘুপদার্থই কার্য্যতঃ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, যেরূপ চুম্বক লৌহমাত্রকেই আকর্ষণ করিলেও বৃহৎ লৌহদণ্ড স্থানচ্যুত হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম লৌহকণাসমূহ সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই অতি সূক্ষ্ম সৎ ও অসৎ প্রভাব স্থূলদর্শী বিষয়িগণের লক্ষ্য না হইলেও সূক্ষ্ম-দর্শী চরিত্রবান সাধুপুরুষগণ, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজেই তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন। সুসভ্য স্বাধীন আমেরিকা ধন্য তুমি! দুই শতাব্দীমাত্র তোমার অভ্যুদয়। এই স্বল্পকালের অক্লান্ত সাধনাতে তুমি অসাধ্য সাধন করিয়া সকলবিষয়েই জগতের শিক্ষাক্ষেত্র হইতেছ। আর ভারত! পতিত ভারত সন্তান যুগযুগান্তের সভ্যতা হারা-ইয়া, সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যমনিষিগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বরাশি উপেক্ষা করিয়া, পাগলের প্রলাপ বলিয়া অবহেলা করিয়া, যে কোন তত্ত্বকথা তোমরা বলিলে, শুনিয়া অবাক হইল,

এবং তোমাদিগকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। প্রিয় বন্ধুগণ। আইস একবার সেই পাগলের প্রলাপবাক্যে বা আর্য্যঋষিগণের গভীর তত্ত্বে ডুবিতে চেষ্টা করি, দেখা যা'ক নবআমেরিকার এ তত্ত্ব নূতন কি না। বা ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর তত্ত্বের আভাস পাই কি না। শাস্ত্রে বলিতেছেন,—সুধু মানব প্রকৃতি নহে, বস্তু মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক। (ভাই। ভয় পাইওনা—সরলভাবে বুঝাইতেছি)। সত্ত্ব —প্রকাশশীল, অর্থাৎ যে গুণ আত্মাকে প্রকাশ করে—দয়া, ক্ষমা, উদারতা ও বিবেকাদি ভাব আনয়ন করে। রজঃ —ক্রিয়াশীল অর্থাৎ যে গুণে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে কাম, ক্রোধ, লোভ, বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি এই গুণের ক্রিয়া। তম —স্থিতিশীল অর্থাৎ যে গুণে মোহ হয়, তমগুণের বিকারই নিদ্রা, আলস্য, ভ্রান্তি, মোহ ইত্যাদি।

এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বশতঃই ব্যক্তি ও বস্তু সমূহ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা সত্ত্বগুণপ্রধান, রজোগুণপ্রধান ও তমগুণপ্রধান হইয়া থাকে। যেমন সাধুব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই দয়া, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ-প্রধান। আবার বিষয়ানুরক্ত ভদ্রমণ্ডলীমধ্যে কি দেখিতে পাও?—তাঁহারা নানারূপ কামনা বা অর্থ-লোভের বশীভূত হইয়া কত পরিশ্রম করিতেছেন ও সর্ব্বদা

ক্রিয়াশীল রহিয়াছেন; ইঁহাবাই বজোপ্রধান। আবাব অতি নিম্নশ্রেণীব লোকদেব মধ্যে কি দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাদেব বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাই কষ্টসাধ্য কোন কার্য্য কবিতে চায় না, যৎসামান্য পবিশ্রম দ্বারা বা অনায়াসলব্ধ ভিক্ষাদ্বাবা কোনপ্রকাবে উদবপূর্ণ করিয়া, আলস্য, নিদ্রা বা অতি অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে মৃতপ্রায় বা পশ্বাদির মত জীবন কাটাইয়া যায়, ইহাবা ঘোব তমগুণাক্রান্ত। এখন বুঝিতে পাবিলে, এই গুণত্রয় ভেদে মানুষ কেমন বিভিন্ন-প্রকৃতি হইয়া পড়ে। কেহবা এই মনুষ্যজীবন, ধূলা খেলাব সামগ্রী মনে কবিযা সুধু আলস্য, নিদ্রা বা কুৎসিৎ আমোদ কাটাইযা দেয়, কেহবা লালসা বা বিষয়েব বশবর্ত্তী হইযা কত খাটিতেছে, কত বিদ্যা, কত শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা কবিতেছে, কত ধন, যশ, মান, উপার্জ্জন করিয়া সাংসাবিক বা পার্থিব উন্নতির চূড়ান্ত করিতেছে (যেমন অধুনাতন ইংবেজ জাতি এবং তাঁহাদের অনুকরণে আমরা।) আবার কেহ বা দয়াদাক্ষিণ্যক্ষমা, উদারতা ও বিবেকবৈবাগোব অবতাব-স্বরূপ হইয়া চবিত্রের উৎকর্ষসাধন দ্বাবা নবলোকেই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছেন (যেমন সাধুসন্ন্যাসীগণ)। সুধু তাহাই নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন।

আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাৎ ॥
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

পরাশর।

যেমন জলে একবিন্দু তৈলনিক্ষেপ করিলে তাহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আমরা অপবিত্র জনের সংস্রবে আসিলে তাহার পাপ বা অপবিত্রতা আমাদিগেতেও সংক্রামিত হয়। এই সংস্রব কি? এক আসনে উপবেশন বা শয়ন, একত্র ভ্রমণ, আলাপন বা ভোজন—এই সংসর্গ হইতেই পাপ বা মন্দভাব বা তমোভাব সংক্রামিত হয়।

প্রিয় পাঠক! এখন বুঝিলে কেন হিন্দুসমাজে এত বাধ বিচার? ইহার অন্নগ্রহণ করিতে নাই, উহার জল ছুঁইতে নাই, তাহার ছায়া স্পর্শেও স্নান করিতে হয়? এসমস্ত সাধারণতঃ অতি অনুদার, অতি সংকীর্ণমনের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়—যেন উচ্চ নীচকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু সহৃদয়, সুবোধ পাঠক, তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে; ইহা অনাদর বা ঘৃণাজনিত নহে; বরং শাস্ত্রের মত এই ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বীয় সন্তানের মত স্নেহ চক্ষে দেখিবেন, এবং শূদ্র ব্রাহ্মণকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিবেন। আবার শাস্ত্রই বলি-

তেছেন, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ ;—ভগবদ্ভক্ত সাধু হইলে চণ্ডালও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই দেখিতে পাই ভক্তবর গুহক চণ্ডালের অর্দ্ধভুক্ত ফলমূল শ্রীরামচন্দ্র সাদরে ভক্ষণ করিলেন, ভক্ত চণ্ডালের প্রেমালিঙ্গনে কৃতার্থম্মন্য হইলেন। এই সেদিন ভক্তাবতার নরোত্তমদত্ত কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া, বিষয়তৃষ্ণায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইলেন, মহাসাত্ত্বিক ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন—আর হিন্দুসমাজ-গুণগ্রাহী হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ঠাকুর উপাধিতে বিভূষিত করিলেন, বৈষ্ণবসমাজ—শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বৈষ্ণবসমাজ—সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ব্রাহ্ম্কুলতিলক নিমাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-সমাজ নরোত্তমঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পাইয়া ধন্য হইল। কেমন করিয়া বলিব ব্রাহ্মণ অপরজাতিকে ঘৃণা করেন।—আর্য্যগণ গুণদর্শী, গুণগ্রাহী, এই গুণেরই পূজা করেন। এই গুণই বীরত্ব, এই গুণই শক্তি; এই বীরপূজা বা শক্তিপূজা, তাঁহারা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে চিরকালই করিয়া আসিতেছেন। তাই দেখিতে পাই, যে যবনের ছায়াস্পর্শ হিন্দুগণ অপবিত্রমনে করেন, সেই যবনযোনিতে

জন্মগ্রহণ করিয়া ও যবন অন্ন প্রতিপালিত হইয়াও জনৈক যবন যেই সচ্চরিত্রতার ও ভক্তিপ্রবণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, সাত্ত্বিকগুণের জলন্ত আভা প্রকাশিত করিলেন, অমনি তিনি হিন্দুসমাজে হরিদাস প্রভু বলিয়া আখ্যাত হইলেন, ন'দে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ-প্রমুখ হিন্দুসমাজ হরিদাসের স্তব পাইয়া নাচিয়া উঠিল, জীবন পাইল, ধন্য হইল। কেমন করিয়া বলিব, ব্রাহ্মণ যবনকে ঘৃণা করেন? ব্রাহ্মণ গুণগ্রাহী, গুণেরই পক্ষপাতী। এই গুণ-বৈষম্য হইতেই জাতির উৎপত্তি। এই গুণের সংক্রামিকা শক্তি আর্য্যগণ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই (শুধু আত্মরক্ষার নিমিত্ত) সর্ব্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন,—ইহার সহিত আহার নিষেধ, উহার সহিত উপাসনা নিষেধ ও তাহার ছায়াস্পর্শ নিষেধ। প্রিয় বন্ধুগণ। দেখিলে, নব আমেরিকা যে তত্ত্বের আবিষ্কারে অধুনা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, আর্য্যসভ্যতা তাহা কত যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আবিষ্কৃত, ব্যবস্থিত ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

এখানে হয় তো সহৃদয়, উন্নতিশীল যুবকবৃন্দ মনে করিতেছ—একি ভয়ানক কথা। সাধু স্বীয় সাধুতা বা সত্ত্বগুণ লইয়া পৃথক্ হইয়া থাকিবেন, আর প্রাপী

পাপপঙ্কে বা তমোরাশিতে নিমগ্ন রহিবে।—

স্নেহ করিয়া, ছোট ভাই বলিয়া, হাত ধরিয়া কেহ তাহাকে তুলিবেন না, তাহাকে স্পর্শ করিবেন না—পাছে আপনি অপবিত্র হন। বন্ধুগণ, বিচলিত হইও না। আইস, শুনি, শাস্ত্রই এ সমস্যার কি সুন্দর মীমাংসা করিতেছেন।—

"হন্ত্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধং তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধস্তু তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি॥"

হারীত।

যেরূপ পাপীর সংসর্গে পবিত্র চরিত্রও পাপযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ আবার পবিত্রের সংসর্গে পাপীও শোধিত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া উঠে। সহজ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছি। একটি পাত্রে এক ছটাক কাল রং লও, উহার সহিত এক ছটাক সাদা রং মিশাও। কি দেখিলে? সমস্তই কাল হইয়া গেল। আচ্ছা, উহার সহিত আরো দশ ছটাক সাদা রং মিশাও। এখন কি দেখিতেছ?—অনেক সাদা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাল বর্ণের আভাস এখনও রহিয়াছে। আরো দশ ছটাক সাদা রং মিশাও তো। এখন কিরূপ হইল।—সব পরিষ্কার সাদা হইয়া উঠিল, কাল রং কোথায় লুকাইল। প্রিয় পাঠক! জড় জগতে যেরূপ দেখিলে, আধ্যাত্মিক জগতেও

ঠিক সেইরূপই জানিবে। তোমার, আমার, এবং সমাজের সর্ব্বসাধারণের সাত্ত্বিক ভাব যাহা আছে, তাহার পরিমাণ অতি অল্প, তাহার প্রভাবও অতি মৃদু, সুতরাং অপবিত্রভাব সংস্রবে গেলে, তমগুণাক্রান্তের প্রভাবে পড়িলে, ঐ এক ছটাক সাদা রঙের যে দশা দেখিতে পাইলে তাহাই হইবে—কাল, কলঙ্কিত বা অপবিত্র হইয়া পড়িবে। আর যাঁহার শতছটাক সাদা রং আছে, যাহার পবিত্রতার পরিমাণ অত্যধিক, যাঁহার সত্বগুণরাজী সর্ব্বদা উদ্ভাসিত হইতেছে, তাঁহাকে একছটাক কালরঙ্গে কি করিবে? তাঁহাকে পাপসংস্পর্শে কি করিবে? তাঁহাকে তমগুণাক্রান্ত ব্যক্তি বা বস্তুতেই বা কি করিবে? সে যে সত্বগুণের সাগর। দেখিতেছ মা অবিরত কতশত নদনদী নানাদিক হইতে সাগর-সঙ্গমে ছুটিতেছে, কৈ তাহারা সাগরের লবন স্বাদ কি কমাইতে পারিতেছে। বরং নদী-জলই বহুদূর পর্য্যন্ত স্বীয় স্বাদ হারাইয়া লবনাক্ত হইয়া পড়িতেছে। সেইরূপ জগদ্বাসীর রাশি রাশি পাপের সংস্রবে আসিয়াও বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি নরদেবগণ আপন আপন অসীম মহত্ব বিন্দুমাত্রও হারাইলেন না, বরং সেই মহত্বগুণে জগজ্জনের পুঞ্জীকৃত পাপ সমূহই ধ্বংশ হইতে লাগিল। (মানুষের তো কথাই নাই, ব্যাঘ্রভল্লুকাদির হিংস্র স্বভাব পর্য্যন্ত

সত্ত্বতেজের প্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, নতুবা হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় সাধুসন্ন্যাসীর চির-বাসস্থান কিরূপে সম্ভব?)। তাই দেখিতে পাই জীব-ন্মুক্ত তৈলঙ্গস্বামীর ভেদাভেদ নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণের ভেদাভেদ নাই। জাতিভেদ কি থাকিবে। বেশ্যাদর্শনে মায়ের বিভূতি, বিষ্ঠাচন্দনে সমানজ্ঞান। এরূপ মহাপুরুষ এখনও রহিয়াছেন, হিন্দুসমাজের ভেদা-ভেদ, জাতিভেদ যাঁহাদের ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারি-তেছে না, অথচ তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত বা গুরুজ্ঞানে ব্রাহ্মণের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ, সমাজের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও তাঁহার উচ্ছিষ্ট বা প্রসাদ পাইয়া, তাঁহার চরণরেণু মাথায় লইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন সেই অভিন্নদর্শী মহাপুরুষগণই আবার বলি-তেছেন—জাতিধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা উঠিতে পারিবে না, পতন হইবে। একটি চারা গাছ রোপণ করিলে, প্রথমতঃ তাহার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়, নতুবা গোমেষাদিতে খাইয়া ফেলে, কিন্তু গাছটী যখন এত বড় হইয়া উঠিল যে, তাহার ডালপালা আর গবাদি পশুতে ধরিতে পারে না, তখন আর সেই বেড়ার দিকে গৃহস্থের দৃষ্টি থাকে না, ক্রমে

ক্রমে তাহা আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া যায়। প্রিয় পাঠক। জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্মও এইরূপ। ইহার বেষ্টনে বা গণ্ডীতে আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনদ্বারা পবিত্রতা বা সাত্বিক ভাব ক্রমে বাড়াইতে বাড়াইতে যখন জীবন সত্বগুণময় হইয়া পড়ে, যখন সংসারের পাপ বা তমোভাব হইতে কোন আশঙ্কা থাকে না, তখন এই সকল ভেদাভেদ আপনি চলিয়া যায়। যেমন গুপারী গাছের পাতা, গাছের পুষ্টি-সাধন করে, তখন কাটিয়া ফেল, গাছটী শুষ্ক বা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে, কিন্তু সেই পাতা না কাটিলেও তাহা চিরদিন গাছে থাকে না, যতদিন প্রয়োজন, ততদিন থাকে, তার পর ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া আপনা আপনি পড়িয়া যায়। ঠিক সেইরূপ জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ। যাহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে কত হেতুবাদ, কত আন্দোলন, কত বক্তৃতা বা লেখনী চালন হইতেছে। সেই সমস্ত আন্দোলনের কুহকে ভুলিয়া অসময়ে এই ভেদভাব উঠাইতে চেষ্টা করিলে সেই বেষ্টনবিহীন চারাগাছের মত বা ছিন্নপত্র গুপারী গাছের মত আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মবল বা সাধনবল থাকিলে, কালক্রমে, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে এই ভেদজ্ঞান অবশ্যই থাকিবে না, সিদ্ধ অবস্থাতে নিষ্প্রয়োজন

বলিযা আপনাআপনি তিরোহিত হইবে, যজ্ঞোপবীত ও জপমালা খসিয়া পড়িবে ও কর্ম্মসাধন লোপ পাইবে এবং এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মময় দর্শন ক বয়া সাধক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবেন। কিন্তু আবাব বলি, সাবধান। এই চরমাবস্থা অনেক সাধন সাপেক্ষ; বিষয়ানুবক্ত তোমাব আমাব পক্ষে সহজসিদ্ধ নহে।

খাদ্যাখাদ্যবিচার।

সুবোধবৃন্দ। এখন তোমবা আর্য্যধর্ম্মেব সারভূত খাদ্যাখাদ্যের ভেদ সহজেই বুঝিতে পাবিবে। মানুষেব মধ্যে যেমন সত্ত্বরজোতমোগুণেব ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্তু মাত্রেবই সেইরূপ। পুষ্প চন্দন, ধূপধুনা প্রভৃতিব গন্ধে এবং হবিষ্যান্ন ভক্ষণে স্বতঃই সত্ত্বগুণেব বৃদ্ধি হয়, আবাব মৎস্যমাংস, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য বস্তুব গুণে মানুষ রজ ও তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বিভাগ করিয়াছেন, এবং উচ্চাধিকাবী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচাবী, বিধবা প্রভৃতিব জন্য সাত্ত্বিক খাদ্যেব ব্যবস্থা কবিযাছেন, আব তামসিক খাদ্যসমূহ পরিত্যাগ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধাবণকেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাই মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"যক্ষরক্ষপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥"

মদ্যমাংসসুরা প্রভৃতি যক্ষরক্ষপিশাচ গণেরই খাদ্য; দেবতার প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণগণ কদাপি তাহা ভক্ষণ করিবেন না। পক্ষান্তরে, গুণকর্ম্মের বিভিন্নতাবশতঃ মানুষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেই হইবে, এই ধ্রুব সত্য আর্য্যগুরু মহাত্মা মনুর অবিদিত ছিল না, তাই তাঁহার আবার ব্যবস্থা হইল—

"ন মাংসভোজনে দোষোন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

মদ্যমাংসমৈথুন প্রভৃতি দোষের নহে, কেননা ইহা প্রাণীমাত্রেরই প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিতে মহাফল। এই প্রবৃত্তি প্রাণীসমূহের সাধারণ ধর্ম্ম; ইহার বশেই প্রাণীজগৎ চালিত হইতেছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু গণ যে প্রাণিবধ করিয়া মাংস ভক্ষণদ্বারা জীবনধারণ করিতেছে, ইহা প্রবৃত্তির কার্য্য, কুকুরগণ যে সময়বিশেষে মৈথুন-লোলুপ হইয়া ভীষণদংশনে পরস্পরের প্রাণসংহারেও প্রবৃত্ত হয়, ইহাও ঐ প্রবৃত্তির কার্য্য, আবার নিম্নশ্রেণীর অসভ্য মনুষ্যগণ তীরধনু লইয়া, তথা সভ্যতাভিমানী

শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যে অস্ত্রাস্ত্রদ্বারা প্রাণী সংহার করিয়া তদীয় মাংসে উদর পূরণ করে, তাহাও এই দুর্নিবার্য্য প্রবৃত্তির দাসত্ব। এই প্রবৃত্তি, সুতরাং, প্রাণীজগতের স্বাভাবিক সাধারণ ধর্ম্ম। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলই এই প্রবৃত্তিমার্গে চালিত হইয়া আপন আপন প্রাণধারণ ও জীবস্রোত অপ্রতিহত রাখিতেছে। ইতর জীবের একমাত্র সম্বল এই প্রবৃত্তি, এতদ্ব্যতীত তাহাদের কার্য্য করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মানুষের ইহা ভিন্ন অপর একটি ধর্ম্ম আছে, তাহা নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিবশে আমরা অসৎ বা তামসিক বিষয়ে প্রলুব্ধ হইতেছি, কিন্তু বিবেক বলে তাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে তাহা হইতে দূরে থাকিতেছি। ইহাই নিবৃত্তি, ইহাই মানবজাতির বিশেষত্ব, ইহাই মনুষ্যত্ব। সুতরাং মানুষ যতক্ষণ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, ততক্ষণ সে সাধারণ জীবমাত্র— ইতর প্রাণীর সমশ্রেণীস্থ, আর যখন মানুষ প্রবৃত্তিপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখই সে মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করে, তখন হইতেই তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ আরব্ধ হয়। এই নিবৃত্তিকেই মনুসংহিতাকার "মহাফলা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবৃত্তির

দাস যতক্ষণ, ততক্ষণই রত্নাকর ঘোরতমসাচ্ছন্ন পশুহননরত হিংস্রপশুবৎ রত্নাকর দস্যু, আর এই প্রবৃত্তি মার্গ উল্লঙ্ঘনকারী নিবৃত্তি পথের পথিক রত্নাকরই চরমে রত্নফলপ্রসূ আদি কবি মহামুনি বাল্মীকি, যাঁহার বাক্যামৃত পানে সভ্যজগৎ অনন্তকাল পরম পবিতৃপ্তিলাভ করিবে। তাই বলিতেছি, প্রিয় যুবকবৃন্দ, আমরা কেন প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া ইতর জীবের সমশ্রেণীস্থ হইয়া থাকিব। চল আমরাও অসৎ প্রবৃত্তি সমূহ সংযমিত করিয়া নিবৃত্তি পথের পথিক হই, তবেই মানুষ হইতে পারিব, তবেই নূতন বলে সৎপ্রবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ সঞ্জীবিত হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইব। "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এই মহাবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ ও অনুসরণ পূর্ব্বক মদ্যমাংসাদি তামসিক বস্তুসমূহ অখাদ্য বা পশু-পিশাচাদির খাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইও।

উপাসনাভেদ।

সত্যানুরাগী সুবোধ শিশু! জিজ্ঞাসা করিতে পার, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও ব্রাহ্মধর্ম্মমতে উপাসক সমূহ এক সাধারণভাবে উপাসনা করেন, সমস্ত ব্রাহ্মভ্রাতার একরূপ উপাসনা, সমস্ত মুসলমানের একরূপ নামাজ এবং সমস্ত খ্রীষ্টানের একরূপ প্রার্থনা-প্রণালী, তবে আমাদের বেলা এত

গণ্ডগোল কেন? কেহ সাপের পূজা করে, আবার তাতে মদ খায়, মদ দেয়, যেন সাপে না কামড়ায় এই কামনা করিয়া। কেহ শনির পূজা করে, যেন শনির কোপে না পড়ে, এই সংকল্প করিয়া। কেহ বা রক্ষাকালীর পূজা করে, তাতে আবার মেষমহিষ কাটে, রক্তের স্রোত বহে, যেন মা কালী মোকদ্দমায় জয় দেন, আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এই মনন করিয়া। কেহ আবার সেই মায়েরই পূজা করেন—পাটা বলি নাই, শুধু ফলফুলনৈবেদ্য দ্বারা,—কামনা করেন, মা আমার কামক্রোধাদি রিপুসমূহ তোমার ঐ শাণিত অসিদ্বারা ছেদন কর, আমাকে অভয় দেও, যেন পাপপ্রলোভনে পতিত না হই, বর দেও, যেন তোমার ঐ রাঙ্গাচরণে স্থান পাই। কেহ বা দুর্গাপূজা করিয়া বলিতেছে—'ধনং দেহি যশো দেহি পুত্রং পৌত্রঞ্চ দেহি মে', আবার কেহ বলিতেছেন,—বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী পরমবৈষ্ণবী মা! আমাকে বিষ্ণুভক্তি দাও, আর কিছুই চাই না। পক্ষান্তরে কেহ বা কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়াকাণ্ড গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লোকালয়ের নির্জ্জন প্রান্তে বা গভীর বনে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত। এরূপ অপরূপ উপাসনাভেদ—এরূপ আকাশ পাতাল ভেদ যে আর্য্যধর্ম্মে, তাহার কি কোন সমন্বয় নাই? প্রিয় পাঠকগণ, চিন্তা করিওনা। এখানেও

দেখিবে, সেই সূক্ষ্মদর্শী আৰ্য্যঋষিগণ মানব-প্রকৃতির অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া যে মহাতত্ত্বের উদ্ধার করিয়াছেন, যে সত্ত্বরজস্তমের প্রভেদ আবিষ্কার করিয়াছেন, এই ভেদাভেদও তাহারই সুফল। অধিকারভেদে উপাসনার প্রকারভেদ আর্য্যধর্ম্মের মূলসূত্র। তম-প্রধান অতিনিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ, যাহারা সর্ব্বদা মদ্যমাংস লইয়াই থাকে, মদ্যমাংসেই যাহাদের সুখশান্তি, বিদ্যোপার্জ্জনজনিত সুনির্ম্মল সুখের বাসনা কখনও যাহাদের মনে স্থান পায় না, বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণির পূজার কথা তাহাদিগকে বলিলে তাহাতে তাহারা কর্ণপাত করিবে কেন? তাহাতে তাহাদের সামর্থ্য কোথায়? মদ্যমাংস-দ্বারা সর্পের বা বগলার পূজাই তাহাদের প্রকৃতির উপযোগী, তাহাতেই তাহাদের অধিকার। কিন্তু তাহাতেও তাহারা সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেছে; কারণ সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মশক্তির লীলা ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। আবার রজোগুণাক্রান্ত বিষয়ানুরক্ত জনসমাজ, যাহার ধন চাই, মান চাই, পুত্র চাই তাহার নিকট নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা বা নির্ব্বাণ মুক্তির কথা কহিলেই বা সে শুনিবে কেন? তাহাতে তাহার অধিকার কোথায়? তাই তাহার জন্য

তদুপযোগী পূজোপকরণ। পক্ষান্তরে, যিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্ত্বপ্রধান মহাপ্রকৃতির জন্য আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন কোথায়? তিনি সেই ব্রহ্মধ্যান-সাগরে মগ্ন হইয়া সমস্ত গণ্ডগোল, সমস্ত ভেদাভেদের অতীত হইয়াছেন। প্রিয়বন্ধুগণ, বুঝিতে পারিলে, **মানবসমাজে সত্ত্বরজতমোগুণের প্রভেদ কোন কালেই যাইবে না, এবং তদনুযায়ী অধিকার-বিশেষে উপাসনার বিশেষত্বও উঠিবে না।** যাঁহারা তাহা উঠাইতে চান, একবারে সর্ব্বসাধারণকে ব্রহ্মসত্তা বুঝাইতে চান, তাঁহারা তাহা কখনই পারিবেন না। **—কারণ তাহা প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ।**—প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, কাহার সাধ্য?

গুরুবাদ।

এই গুরুবাদ প্রথাটী সনাতন আর্য্যধর্ম্মের **মূলীভূত বিশেষত্ব।** ব্রাহ্মণগণ আচার্য্যের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ পান- আচার্য্য একপ্রকার গুরু বা উপদেষ্টা, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় যাজকের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন—এই যাজক একপ্রকার ধর্ম্মের শিক্ষক। আবার মুসলমানগণ মোল্লার

নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা পান,—এই মোল্লা একপ্রকার ধর্ম্মগুরু। এইরূপ যাহার নিকট হইতেই আমরা ধর্ম্মবিষয়ে যে কিছু শিক্ষা লাভ করি, তিনিই আমাদের ধর্ম্মগুরু। ইহা একপ্রকার কথা। ইহাতে গুরুর দোষ, ত্রুটি, ভ্রান্তি থাকিতে পারে, এবং শিষ্য যে শিক্ষা পান, তাহাও সুতরাং, ভ্রমপূর্ণ বা অপূর্ণ হইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ গুরুর তো সংখ্যাই নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, বা পবনসাধনতত্ত্ব শিক্ষার জন্য যথাশাস্ত্র লক্ষণাক্রান্ত, সাত্ত্বিক মহাপুরুষের নিকট হইতে যথাশাস্ত্র দীক্ষা ও শক্তিসঞ্চার – ইহাই প্রকৃত গুরুকরণ—ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব ও গভীর রহস্যময়। ইহাতে শ্রীগুরুদেব মানব হইয়াও অভ্রান্ত সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম। প্রিয়পাঠক, চল আমরা জগৎগুরু পরব্রহ্মের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া সহজ দৃষ্টান্তের আলোতে তদীয় লীলারহস্যের উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হই।

এক মাসের শিশুকে ভাত খাইতে দেও, সে তাহা গ্রহণ করিবে না, জোর করিয়া গলাধঃকরণ করাও, হয় বমন করিয়া ফেলিবে, নয় জীর্ণ করিতে না পারিয়া উদর-রোগাক্রান্ত এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। তাই সবল বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য ডালভাত রুটির ব্যবস্থা হইলেও দুর্ব্বল শিশুসন্তানের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। মাতা ঐ সমস্ত

ভক্ষণ করেন। বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানক্রমে সেই সমস্ত মাতৃশরীরে দুগ্ধ হইয়া শিশুপ্রকৃতির উপযোগী খাদ্যরূপে পরিণত হয়। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা অনাদি পুরুষই মাতৃরূপে স্তন্যসুধাদ্বারা শিশুর দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। শিশু হাসে-কাঁদে, হেলে দোলে, কিন্তু তাহার মন ঐ মাতৃস্তন্যে। যেই মাতৃস্তন্যমুখে লাগিল, অমনি মাতার সমস্ত শরীর হইতে সার-ভূত দুগ্ধধারা স্তনমুখে আসিল, সন্তান পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। সেই মাতৃদুগ্ধে শরীর ধারণোপযোগী পদার্থসমূহের একত্র সমাবেশ, পৃথিবীতে দুগ্ধব্যতীত এমন কোন পদার্থ নাই, শুধু যাহা গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকা যায়। প্রিয় পাঠক, দেখিলে বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা—কৌশল!—নতুবা দুর্ব্বল সন্তানের কি রক্ষা ছিল। ঠিক সেইরূপ মানবসমাজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া, জগৎ হিতব্রতে যাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সাত্ত্বিকস্বভাব সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জন্মজন্মান্তরের কঠোর-সাধনবলে যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহারই সারভূত আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জীবকে শিক্ষা দিলেন, বিষয়াসক্ত মানব অন্ধকারে আলোক পাইল, আত্মতত্ত্বের দর্শন পাইল, ব্রহ্মতত্ত্বের আস্বাদ বুঝিল। তখন জগতের সহস্র প্রলোভন

তাহাকে টলাইতে পারিল না, যুক্তিকৌশলে তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেও, মানবমাত্রেরই অপূর্ণতা সপ্রমাণ কর, আর সাধক টলে না, এমন কি প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন সম্ভব হউক, কিন্তু তথাপি শিষ্য স্বীয় বিশ্বাসে অচল অটল, গুরুদেব মানুষ হইয়াও দেবতা, অভ্রান্ত, তাঁহার বাক্য ব্রহ্মবাক্য। শিষ্য যাহা পাইল তাহার তুলনা নাই। মাতৃস্তন্য পানরত সন্তানের নিকট শত শত সুমিষ্ট পদার্থ, নয়নমনোহর বস্ত্রবাজি ধারণ কর, সে তাহা হাতে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিবে, তাহার নিকট সেই শুভ্র দুগ্ধের তারের তুলনা নাই। তাই শিষ্য সেই অতুলনীয় তত্ত্বরসের আস্বাদ পাইয়া, ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া দেব ভাষাতে গাহিলেন—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

চরাচরব্যাপী ব্রহ্মপদ দেখাইলেন যে গুরুদেব, তাঁহাকে প্রণাম। শুধু তাহাই নহে; তিনি দেখিলেন, তাঁহার গুরুদেব অপর কেহ নহেন, বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্মই তাঁহার উদ্ধারের জন্য গুরুদেবরূপে অবতীর্ণ। তাই আবার গাইলেন,

গুরু ব্র্হ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

প্রিয়বন্ধুগণ, দেখিলে, গুরুবাদেব কি অমূল্য, অদ্ভুত রহস্য। আবার দেখ, জগজ্জীবকে এই গুরুকবণের আবশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্যই যেন ভগবানেব অবতাবস্বরূপ মহাপুরুষগণ, আপনারাও গুরু করণ করিয়া ছিলেন। নতুবা প্রেমাবতার খ্রীষ্টদেবের জন (John the Baptist) এর নিকট দীক্ষিত হইবাব কি প্রয়োজন ছিল, ভক্তাবতাব চৈতন্যদেবই বা কি নিমিত্ত ঈশ্বর পুবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আবাব বালকযোগী ধ্রুবের মহাতপস্যায় আসন টলিলেও ভগবান্ নাবদরূপে প্রথমে গুরুকবণ না করাইয়া কেনই বা তাঁহাকে দেখাদিতে রাজি হইলেন না। বন্ধুগণ, এ সমস্ত আমাদের শিক্ষাব জন্যই নয কি ?

পুনরাবৃত্তি।

প্রিয়বন্ধুগণ। চল, একবাব আমরা পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ কবিয়া শিখিয়া বাখি, আর্য্য ধর্ম্ম কি কি ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। ১—

ফুল-ফল-নৈবেদ্যাদি অনুষ্ঠান সহকাবে সাকার উপাসনায় আরম্ভ এবং অধিকাব ক্রমে সকাম হইতে নিষ্কাম পূজাতে উঠিয়া তৎপর ব্রহ্মধ্যানে পরিণতি এবং মুক্তি প্রাপ্তি। ২—

তমঃ, রজঃ এবং সত্বগুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ মানব-প্রকৃতির প্রভেদ, তজ্জন্য প্রকৃতির অনুযায়ী তামসিক রাজসিক এবং সাত্বিক সমাজধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যথাশাস্ত্র পালন করিতে করিতে ক্রমোন্নতির বিধানক্রমে ভেদাভেদের অতীত সিদ্ধাবস্থা ও মুক্তিপ্রাপ্তি। ৩—যথাশাস্ত্র গুরুকরণ এবং গুরোপদেশমত সাধন করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা ও মুক্তি প্রাপ্তি।

উপসংহার—বর্ত্তমান সমাজ।

প্রিয় পাঠক। তুমি আর্য্যসন্তান। আর্য্যধর্ম্মের উপাদান সমূহের মৌলিকত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই বোধ হয়, কত আনন্দিত হইতেছ। হয়তো ভাবিতেছ, এই ধর্ম্মের আবার নিন্দা। তত্বদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিদের সংস্থাপিত জগতে অতুলীয় আর্য্যশাস্ত্রের দোষারোপ। ভাই, স্থির হও। পল্লবগ্রাহী, স্থূলদর্শী, সূক্ষ্মতত্ত্বের মৌলিকতা গ্রহণে অক্ষম অথবা তদ্গ্রহণে অনিচ্ছুক, বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজ তোমাদের শাস্ত্র নিন্দা করে করুক, তুমি তাহা শুনিয়াও শুনিও না, অথবা স্বীয় শাস্ত্র শিক্ষা কর, তাহাদের অসার যুক্তিতে আর তোমাকে সার ধর্ম্ম হইতে টলাইতে পারিবে না।

কিন্তু ভাই, এতক্ষণ হিন্দু ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, আর্য্য-শাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব কথা বলিয়া তোমাকে আনন্দের আলোকে রাখিয়াছিলাম, আইস, আবার তোমার সমাজের ঘোর দুরবস্থা দেখাইয়া নিরানন্দের অন্ধকারে লইয়া যাই। অন্যের নিন্দাবাক্য অসহ্য হইতে পারে, কিন্তু আত্মদোষ সংশোধনের জন্য যদি আমরা আপনাদের দোষ আপনারাই দেখাই, তাহা হইলে ক্রোধের কারণ নাই, বরং তাহা প্রদর্শনই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য।

প্রিয় বন্ধুগণ! দেখিতেছ, সেই আর্য্যশাস্ত্রের অবমাননা করিয়া আমাদের সমাজের কি দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে! শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, প্রাত্যহিক প্রতিকর্ম্মই যে আর্য্যগণ শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করিতেন, আজ কিনা আমরা তাঁহাদের সন্তান হইয়া প্রতি কার্য্যে, পদে পদে সেই শাস্ত্র-বাক্য উপেক্ষা করিতেছি! পূর্ব্বে দেখিয়াছ, মানব-প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর আর্য্যশাস্ত্র সংস্থাপিত; সেই শাস্ত্রবাক্যের উল্লঙ্ঘনও মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ, সুতরাং একই কথা, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে ধ্বংশ নিশ্চয়। তাই ভাই, বঙ্গীয় অথবা ভারতীয় আর্য্যসমাজের এ দুর্দ্দশা! আত্মপাপের

অপরিহার্য্য পরিণতি। গীতাশাস্ত্রে ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুসারেই চতুর্ব্বর্ণের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কি দুঃখের কথা, সেই গুণ ও কর্ম্মের ভেদাভেদ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আর্য্যগুরু ব্রাহ্মণ। তুমিই না শাস্ত্রকর্ত্তা, তুমিই না সমাজ-চালক। তোমার এ দশা দেখিলে আর সমাজ কাহারদিকে চাহিবে, কিসে আশ্বাস পাইবে। তোমার শাস্ত্র বলিতেছে, সাত্বিক ভাব তোমার প্রধান ভাব, সাত্বিক কার্য্যই তোমার প্রধান কার্য্য। এই সাত্বিক গুণকর্ম্মেই তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তুমিই না সেই শাস্ত্রবাক্য পায়ে ঠেলিয়া, শূদ্রের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া কুকুরবৃত্তি, দাস্যবৃত্তি বা পরের চাকরীর জন্য লালায়িত। তোমাদ্বারা আর্য্যসমাজের আর কি আশা আছে। সুরা কি শাস্ত্রে গোমাংসতুল্য উক্ত হয় নাই? পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে ভুলিয়া যজ্ঞোপবীত ধারী তোমরা, সহস্র সহস্র তোমরা, সেই সুরা জলের মত পান করিয়া আর্য্যসমাজ কলঙ্কিত করিতেছ, সমাজের নিম্নস্তরের কথা আর কি বলিব? আর তোমাদের হতে সমাজের কি আশা আছে। শুধু সত্বগুণ হতে রজোগুণে নামিয়া যদি বিদ্যা শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যের উৎকর্ষ বিধান

দ্বারা পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে, তাহা হইলেও বলিবার ছিল, কিন্তু তোমরা অবিদ্যার আশ্রয় লইয়া তমোগুণাক্রান্ত আলস্য, ঔদাস্যের দাস হইয়া দলে দলে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, বিষয়কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, পরমুখাপেক্ষী হইতে শিখিয়াছ, নরপ্রকৃতির নিম্নতম স্তরে নামিয়া আসিয়াছ. তোমাদের দ্বারা আর্য্যসমাজের আর কি আশা আছে! ঐ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছ বলিয়া কি অহঙ্কার হইতেছে? কেন? পিতৃ পিতামহ কোন্ কালে কত সাধ্যসাধনা করিয়া লাখ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, আর তুমি কিনা নিজ কর্ম্মদোষে সে সমস্ত হারাইয়া, এক কড়া কাণা কড়ির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়াছ, আবার আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের না ছিল কি। এই বলিয়া অহঙ্কারে বুক ফুলাইতেছ! ধিক্ ভাই, তোমার অহঙ্কারে, ধিক্ ভাই, তোমার নির্লজ্জতায়! রাগ করিওনা; বুঝিয়া দেখ, স্বকৃত পাপাগ্নিতে স্বেণার সংসার কিরূপ ছারখার করিতেছ। তোমা হইতে আর সমাজ কি আশা করিবে। ভাই ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রগুরু সমাজগুরু ব্রাহ্মণ, নিশ্চয় জানিও তোমার দোষেই ভারতের এ দুর্দ্দশা। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, তোমার দোষেই আর্য্যসমাজ ভ্রষ্ট। তাই ভাই সমাজ সংস্কারকগণ, আর্য্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণ, তোমা-

দিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তোমরা শাস্ত্র মানিয়া চল, শাস্ত্রসম্মত আচারনিয়মের অনুষ্ঠান কর, দেশাচার, অতি তুচ্ছ দেশাচার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার, পদদলিত করিয়া যথাশাস্ত্র পদসঞ্চালন কর; দেখিবে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন নিমস্তরসমূহ আপনা আপনি তোমাদের পদাঙ্কসরণ করিবে। নতুবা পরধর্ম্মের দোষ প্রদর্শনই কর, আর হাজার হাজার বক্তৃতা বা লেখনী চালনা দ্বারা আর্য্যসমাজের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদন কর, হিন্দুসমাজ "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"।

সহৃদয় প্রিয় পাঠক বৃন্দ! তবে কি আমার এই সকরুণ ক্রন্দন বৃথা হইবে? একা আমার ক্রন্দনে ফল নাই সত্য, কিন্তু চল আমরা, সহস্র সহস্র আমরা এক সঙ্গে এক সুরে কাঁদিতে থাকি। এক বিন্দু বৃষ্টি বারি ভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যায় সত্য, কিন্তু সহস্র সহস্র বারিবিন্দু এক সঙ্গে পতিত হইয়া তো নীরস ভূমিকেও সরস করিয়া তোলে, কঠিন ভূমিকেও সুকোমল করিয়া থাকে। তবে আর আমরা নিরাশ হইব কেন? সহস্রপ্রাণ একসুরে কাঁদিলে অবশ্যই বঙ্গসমাজের দৃষ্টি, আকর্ষণ করিতে পারিব, অবশ্যই আর্য্যধর্ম্মের পবিত্রালোক পুনরায় প্রাপ্ত হইব। কিন্তু ভাই, ভুলিওনা, এ সমস্ত ভাবিবার

চিন্তিবাব, দেখিব্রাব শুনিবাব, কঠিনব্রত তোমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। দেখিতেছ না, তোমাদের অগ্রজগণ বিবষমদে কেমন মত্ত হইয়া বহিয়াছেন। তাঁহাদেবদ্বাবা আব এদিকেব কিছু আশা না কবিযা এখন হইতেই তোমবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। চেষ্টা কবিলে যাহা হইবার, তোমাদের দ্বারাই হইবে —ইহাই আমাদেব আশা। মঙ্গলময় পবমেশ্বব! তোমাব ধর্ম্ম তুমি বক্ষা কব। ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগন! তোমাদেব সাধেব সমাজেব দুববস্থা দেখ, তোমাদের সাধনশক্তিসঞ্চার করিয়া এই মৃতপ্রায সমাজকে আবাব জাগাও, নতুবা আর্য্যনাম বুঝি চিবতবে সময়সাগবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।